সামনে কঠিন সময়

নাসিম আহমেদ

'প্রবৃদ্ধির জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে দেশ'। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এ দাবিটি অনেকদিন ধরেই করছেন। তাঁর দাবি এবার জোরাল হবে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের কারণে যেখানে বলা হয়েছে চলতি অর্থ বছর (২০০৫-০৬) বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫% হতে পারে। আমরা গত কয়েক বছর ধরে ৫ থেকে ৫.৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধির কোটায় ঘোরাফেরা করছি। মাঝে অবশ্য (২০০৩-০৪) পরিসংখ্যানের যাদুমন্ত্রে প্রবৃদ্ধি ৬% স্পর্শ করেছিল। ফলে ৬.৫% প্রবৃদ্ধির হার নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী কোনো দেশের প্রবৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক। ক্রমান্বয়ে এক খাতের প্রবৃদ্ধি অন্য খাতকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। এভাবে প্রতিটি খাতের সমৃদ্ধি একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। এগুলো সব বইয়ের কথা। অর্থনীতির পণ্ডিতরাও এই কথা বলবেন। বলবেন অর্থনীতির ছাত্ররাও। কিন্তু বইয়ের সঙ্গে আমাদের দেশের বাস্তবের বিস্তর ফারাক। তা অর্থনীতির ক্ষেত্রেই হোক কিংবা খেলার মাঠে। কোনো ক্ষেত্রেই আমরা নিয়ম-কানুনের পরোয়া করি না। বরং যার যা ইচ্ছে তাই করি। সে কারণেই বাস্তবে কোনোরকম সমন্বয় ছাড়াই চলছে দেশ!

দেশের প্রবৃদ্ধি শতকরা ৬.৫ হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। তারচেয়েও বড় কথা, এই প্রবৃদ্ধি উন্নয়নে আদৌ কোনো ভূমিকা রাখবে কি না। অর্থনীতির তত্ত্ব এবার ফেল করতে পারে। বিফল হবার মূল কারণ ঘাটতি। বিদ্যুৎ, পানি, সার, জ্বালানি তেল, ডলার সবকিছুর ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অবশ্য এমন নয় যে, এই ঘাটতির কথা আগে বলা হয়নি। মিডিয়ায় এসেছে বহুবার। কিন্তু, সরকার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তাদের ভাবখানা এমন যে, কোনোভাবে দেশ চললেই হলো। দেশ চালানোর দায়িত্ব তো তাদের নয়! এই দায়িত্ব তো জনগণের। তারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। দামি গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ানো থেকে শুরু করে অন্ন, বাসস্থানের সুবিধা ভোগ করাই তাদের একমাত্র দায়িত্ব। তারপরও আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের বর্তমান নির্বাচিত সরকারের কর্মকর্তাগণ এডিবির রিপোর্টের বয়ান নিয়ে অনেক কথা বলবেন। বড় বড় বুলি শোনাবেন। এডিবির হিসাবে এই প্রবৃদ্ধির ভিত্তি ছিল আউশ ও আমন ধানের ফলন। এ দু'ধরনের বাম্পার ফলনের হিসাব থেকেই এডিবি ৬%-য়ের ওপরে প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে। এর সঙ্গে রপ্তানি ও রেমিটেন্সের ক্রমবৃদ্ধি তো আছেই।

ধান উৎপাদন, রেমিটেন্স, রপ্তানি ও মানবসম্পদ রপ্তানির চিত্রগুলো আশাব্যঞ্জক। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এগুলো কতোদিন অব্যাহত থাকবে? ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ ঘাটতিতে নাভিশ্বাস ওঠার দশা আমাদের। রাজধানী ঢাকায় লোডশেডিংয়ের কবলে পড়তে হচ্ছে প্রায় সব এলাকার মানুষকে। গত কয়েক বছর জুন-জুলাইয়ে প্রচন্ড গরমে তিন-চারবার লোডশেডিং হতো। এখন ফেব্রুয়ারি মাস যাবার আগেই ৩-৪ বার লোডশেডিং হচ্ছে। দিন দিন বেড়ে চলছে দ্রুত বিদ্যুৎ ঘাটতি। এ ঘাটতি ১৫০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে যাবে। বিদ্যুৎ ঘাটতি যদি ফেব্রুয়ারিতেই এ অবস্থায় যায় জুন-জুলাইয়ে অবস্থা কি হবে তা ভাবার বিষয়। ঘাটতির দিক থেকে এবার আমরা রেকর্ড করতে যাচ্ছি। খোদ রাজধানীতেএই যখন এই অবস্থা তখন সারাদেশের চিত্র যে কতখানি ভয়াবহ তা আর ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না।

বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্য শুধু জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা নয়, সমস্যা হচ্ছে কারখানার উৎপাদনেও। বারবার ব্যাহত হচ্ছে উৎপাদন। তাই সময়মতো মালামাল যেতে পারছে না বাজারে। রপ্তানি ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ীরা হিমশিম খাচ্ছে শিডিউল বজায় রাখতে। বিদ্যুৎ ঘাটতিতে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট গার্মেন্টসগুলো। প্রায় ৬০০ ছোট গার্মেন্টস ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'কারখানা চালানোই তো এখন কঠিন। ঘন্টায় ঘন্টায় বিদ্যুৎ গেলে আসলে কাজ চালাব কীভাবে? তার ওপর তেলের দামও বেড়েছে। জেনারেটর চালানোর খরচও বেড়েছে। কিন্তু উৎপাদন না করতে পারলে টাকা পাব কোথায়? চালানোর খরচ, ব্যাংকের ঋণ শোধ করবো কীভাবে?' শুধু গার্মেন্টস ক্ষেত্রেই সমস্যা আছে তা নয়, সমস্যা দেখা দিয়েছে কৃষি ক্ষেত্রেও। জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় খরচ বাড়ছে। সঙ্গে সারের সরবরাহ না থাকায় সমস্যাটি আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। সেচের জন্য বিদ্যুৎ ও ডিজেল চালিত পাম্পগুলো কৃষকরা ঠিকমতো চালাতে পারছে না। তাই উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বোরো ধানের ফলন ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত। তাই 'ধানে স্বয়ংসম্পূর্ণ' হবার সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে অচিরেই। বছরের শুরু আউশ-আমনের বাম্পার ফলনে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব রাখতে পারছে না। এই না পারার দায়ভার সরকারের। জাতীয় ও স্থানীয় দুই পর্যায়েই। নির্বাচনী প্রচারণায় না মেতে তাদের উচিত ছিল তেল, বিদ্যুৎ ও পানি সমস্যা সংকটের মোকাবিলা করা। সরকার তা না করে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে।

ডলারের বাজারের পরিস্থিতির জন্যও সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের খামখেয়ালি দায়ী। ডলারের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। বাজারে ডলারে মূল্য ৭০ টাকার ওপরে উঠে গেছে। ঋণপত্রের জন্য ব্যবসায়ীদের এবং বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংককে উচ্চমূল্য দিতে হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক দাবি করছে, মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল। জাতীয় রিজার্ভও আছে সন্তোষজনক পর্যায়ে। অথচ তারা বাজারে ডলার ছাড়ছে না। বরং বাংলাদেশ ব্যাংক মনে করে, তৃতীয় প্রজন্মের কয়েকটি বেসরকারি ব্যাংক ইচ্ছেকৃতভাবে ডলারের সংকট সৃষ্টি করছে। অর্থমন্ত্রীও এর আগে বিভিন্ন সময়ে এসব ব্যাংকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর ক্ষোভটা রাজনৈতিক। কারণ, এই ব্যাংকগুলো বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় অনুমোদন পেয়েছিল।

বৈদেশিক মুদ্রা বাজার ঠিক করতে না পারলে কি হবে, নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের ঋণ শৃঙ্খলায় বিপর্যয় ঘটানোর পথ খুলে দিচ্ছে

বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন এক সার্কুলার জারি করা হয়েয়ে যেখানে কোনো ব্যবসায়ী ঋণের সুদই নয়, আসলও মওকুফের আবেদন করতে পারবে। এমনিতেই আমাদের দেশের ঋণখেলাপির ইতিহাস ভালো নয়। সমাজের বিভিন্ন শিল্পপতি খেলাপি হয়েছে। ঋণ মওকুফের সুবিধা পেয়েছেন এই প্রভাবশালীরাই। সাধারণেরা এই সুযোগ পাননি। কখনো পাবেনও না। নতুন সার্কুলার জারি হওয়ায় ঋণ ও আসল দুটো মওকুফের সুযোগ আসছে। ফলে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি আরও বেড়ে যাচ্ছে। আশ্চর্যজনকভাবে হলেও সত্যি যে, পৃথিবীর কোনো দেশে আসল ও সুদ উভয় মওকুফ করার নজির নেই। বাংলাদেশেই একমাত্র সম্ভব। কারণ এমন উল্টো-পাল্টা নিয়ম এখানেই চলে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন সার্কুলার একটি ইঙ্গিত বহন করে। আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগে থেকেই হয়তো বুঝতে পারছে এ বছর ঋণ মওকুফের সংখ্যা অনেক বাড়বে। ব্যবসায়ীদের হাতে পয়সা নেই। ব্যবসা চালাতে হলে তাদের ঋণ প্রয়োজন। অন্যদিকে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও পানি ঘাটতি। উৎপাদন বারবার ব্যাহত হবে। ফলে তারা অনেকেই খেলাপি হয়ে যাবেন। আর আশঙ্কাজনকভাবে খেলাপি বাড়লে দেশের বিদেশী বিনিয়োগ কমে যাবে। চোখ রাঙাবে বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের মতো সংস্থাগুলো। তাই হিসাব বইয়ে যেন খেলাপি ঋণের হার কম হয় তার প্রয়াস থেকেই নতুন সার্কুলার জারি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে এমন সার্কুলার আবারও প্রমাণ করল আমাদের অর্থনীতির নাজুক অবস্থা। সেই সঙ্গে সুযোগ করে দিল রাজনীতির সঙ্গে জড়িত কতিপয় সুবিধাভোগকারী শিল্পপতির। তারা নতুন আইনের সুযোগ নিয়ে ঋণ মওকুফ করতে পারবেন। অর্থনীতির তত্ত্ব অনুযায়ী একটি দেশের উৎপাদন নির্ভর করে দক্ষ শ্রমশক্তি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানি সরবরাহের ওপর। শক্তির ক্ষেত্রে ঘাটতিগুলো উৎপাদনের ঘাটতি সৃষ্টি করবে। বাড়তি ফলনের সম্ভাবনা থাকবে না। আসন্ন নির্বাচনে অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর দিকে নজর না দিলে সরকার ভুল করবে। ফুটবল- ক্রিকেটে আমরা যখন যাচ্ছে তাই খেলে হেরে যাই, তখন চারদিকে খেলোয়াড়দের কমিটমেন্ট নিয়ে হাজারো প্রশ্ন ওঠে। এক ম্যাচের ব্যর্থতা অকালেই শেষ করে দেয় আমাদের অনেক 'স্টার' খেলোয়াড়দের ক্যারিয়ার। অথচ পুরো দেশ যখন অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, জীবনযাত্রার মান হচ্ছে নিম্নমুখী, তখনই কেন এগিয়ে আসছেন না আমাদের সংসদ প্রতিনিধিরা? নাকি তারা ভাবছেন সংসদে যাওয়ার কিংবা ওয়াক আউট করাতেই তাদের কর্তব্য শেষ? দেশের এই কঠিন সময় আমরা কীভাবে মোকাবেলা করবো? -এই প্রশ্নের মূল্য কয়েক হাজার কোটি টাকা।

লন্ডন সম্মেলন

বাংলাদেশকে সাফল্যগুলোও তুলে ধরতে হবে

আগামী ৬-৭ মার্চ, ২০০৬ লন্ডনে অনুষ্ঠিত হবে 'এশিয়া ২০১৫' আন্তর্জাতিক সম্মেলন যেখানে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মত বিনিময় করবেন। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয় হলো আগামী ১০ বছরের মধ্যে এই অঞ্চলের দারিদ্র্য কিভাবে দ্রুততার সঙ্গে কমিয়ে আনা যায়, সে বিষয়ে কিছু কৌশল নির্ধারণ। বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদান করবেন। ব্রিটিশ উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডি বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সঙ্গে যৌথভাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করছে। আয়োজকরা মনে করছেন, গত বিশ বছরে অন্য যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ লোককে দারিদ্র্যসীমার বাইরে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও এশিয়ায় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানীয় ও পয়ঃনিষ্কাষণ, সুশাসনের অভাব এখনও বড় ধরনের সমস্যা রয়ে গেছে।

সিরডাপ গোলটেবিলে সভাপতিত্বে করেন ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনাম

সম্মেলনের প্রস্তুতি হিসেবে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ডিএফআইডি এবং ডেইলি স্টারের যৌথ উদ্যোগে এক গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহফুজ আনামের সভাপতিত্বে গোল টেবিলে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিএফআইড বাংলাদেশের প্রধান ডেভিড উড। গোল টেবিল আলোচনায় অংশ নেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান, পিকেএসএফ-য়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফখরুদ্দীন আহমদ, অর্থনীতিবিদ ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, ড. আশরাফউদ্দিন চৌধুরী, ফারুক সোবহান, এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের প্রধান নাসরিন হক, তালেয়া রেহমান প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাসের কর্মসূচি গতিশীল করতে বিভিন্ন প্রকার অংশীদারিত্বকে কাজে লাগাতে হবে। কিন্তু এর আগে দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা ও জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম রোধ করতে হবে। এতে আরো বলা হয় এশিয়ায় বাংলাদেশ, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, শ্রীলংকা ও ভিয়েতনাম এই দেশগুলোর মধ্যে সাফল্য ও ব্যর্থতার পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি কিছু অভিন্ন চিত্রও রয়েছে। তাঁরা আরো বলেন, লন্ডন সম্মেলনে বাংলাদেশের সাফল্যের চিত্রগুলোও তুলে ধরা প্রয়োজন। তারা আরো বলেন যে দাতাগোষ্ঠীর ভূমিকা এখন নতুনভাবে নির্ধারণ করতে হবে। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, জাতীয় ও উপ-আঞ্চলিক উন্নয়ন অংশীদারিত্ব কার্যক্রমে সক্রিয় রয়েছে। যেমন, জাতিসংঘের সাথে ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ফর ২০০৬-১০ প্রকল্পে স্বাক্ষর করেছে। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে, যা এদেশে বিদেশী সহায়তা অনুবিধি হিসাবে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

তবে তারা এও বলেন যে জাতীয়ভাবে, সরকার বিভিন্ন পেশাজীবী ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনায় অংশ নিলেও এদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানিক কোন অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা চালু নেই। সমন্বিত সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব এখনও গড়ে ওঠেনি। স্থানীয় পর্যায়ে অংশীদারিত্বের অভাব আরো বেশি, কারণ কার্যকর স্থানীয় সরকারের কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে বিদ্যমান অংশীদারিত্বসহ বেসরকারি কার্যক্রমে চিহ্নিত জনগোষ্ঠিকে অংশীদার হিসাবে যুক্ত করা হয় না, তারা কেবল চিহ্নিত গোষ্ঠি হিসাবেই চিহ্নিত থাকে। দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন ও যোগ্যতা উন্নয়ন, কৌশল উন্নয়ন, সঠিক লক্ষ্যমাত্রা চিহ্নিত করণ ও প্রয়োগ এবং তাদের সুশাসনে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকারের অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার বিষয়ে সমন্বিত পর্যালোচনা প্রয়োজন।